দৈনিক বাংলা

203

তারিখ ... 20|3|80 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ... ...

স্বনির্ভর এলাকায় গণশিক্ষা অভিযান

মাহবুব আলম চাষী

রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ঠিক তেমনি সম্পর্ক রয়েছে স্বনির্ভরতার সাথে গণশিক্ষার। যে জাতির আট কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ কোটিই নিরক্ষর, সে জাতি কোন দিনই অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারে না।

২। ১৯৪৭-এর দেশ বিভক্তির পর থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে। তেমনি প্রমাণ রয়েছে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা অর্জনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ইতিহাসে।

৩। আমরা জানি মাথাপিছু আয়ের হিসাব উন্নয়নের সুষ্ঠু মাপকাঠি নয়। কারণ এতে উন্নয়নের বন্টনের কোন হিসেব পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মাপকাঠিতে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে পিছনের দিকে—সামনের দিকে নয়। ১৯৭৮-এর বিশ্ব ব্যাংক এটলাসে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের যে হিসাব বেরিয়েছে তাতে আমাদের উন্নয়নের পরিমাণ নিম্নরূপ:

বৎসর	প্রকৃত আয় (মাথাপিছু)
১৯৬০-৭৬ (১৬ বৎসর)	(−) ০.৪%
১৯৭০-৭৬ (স্বাধীনতা উত্তর ৬ বৎসর)	(−) ০.৮%

রৌমারী ও কচুবাড়ি কৃষ্টপুর

৪। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের কিছু কর্মী এ সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই রংপুর জেলার শত্রুমুক্ত রৌমারী থানায় তারা তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সুদূর দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয়ে এবং সেখানেই জন্ম হয় প্রথম নিরক্ষরতা মুক্ত গ্রাম—কচুবাড়ি কৃষ্টপুর। ৫। ১৯৭৩ সালে গ্রামটির সম্মানে সমগ্র দেশের বিশ্ব নিরক্ষরতা দিবস পালিত হলো ঠাকুরগাঁয়ে। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ঠাকুরগাঁয়ের সম্মেলন উদ্বোধন করলেন।

রংপুর স্বনির্ভর আন্দোলন

৬। ১৯৭৪-এ রংপুর জেলার তদানীন্তন জেলা কৃষি অফিসারের নেতৃত্বে যে স্বনির্ভর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বনির্ভর গ্রামে আবার এক ব্যাপক গণশিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছিল।

নলডাঙ্গা ইউনিয়ন সরকারের বাংলাদেশ রেকর্ড

৭। কিন্তু রংপুরের স্বনির্ভর কর্মীদের ভিতরে যে প্রাণচাঞ্চল্য ছিলো তা আর একদিক দিয়ে ফুটে উঠলো—সাদুল্লাপুর থানার নলডাঙ্গা ইউনিয়নে। ১৯৭৮ সনের অক্টোবর মাসে যখন নলডাঙ্গা ইউনিয়ন সরকার তার বিগত বৎসরের উন্নয়নের হিসাব নিকাশ করছিল, তখন তারা দেখতে পেলো যে ৮৪৭৯ জন নিরক্ষরের মধ্যে মাত্র ২৫০ জনকে তারা সাক্ষর করতে পেরেছে এক বৎসরে।

দুই বৎসরে নিরক্ষরতা মুক্তির ওয়াদা

৮। অথচ তারা এপ্রিল—১৯৭৭ সনে সারা বাংলাদেশের ৪০৫২ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের যে সম্মেলন ঢাকায় হয়েছিল তাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে অন্যান্য সকলেরই মত ২ বৎসরের মধ্যে তাদের ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা মুক্ত করার ওয়াদা করেছিলেন। এই সম্মেলনে 'স্থানীয় সরকারই আসল সরকার' মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই উদাত্ত ঘোষণা ও তাদের তখন মনে পড়ল।

৯। আসল সরকারের মত কাজ করার জন্য তারা ওরা নবেম্বর, ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে ইউনিয়ন সরকার এবং সেই সাথে প্রত্যেকটি সদস্যদের নেতৃত্বে প্রতি গ্রামে অনুরূপ এক একটি গ্রাম সরকারও গঠন করেছিলেন।

১০। নলডাঙ্গা আসল সরকারের প্রথম বৎসর নিরক্ষরতা মুক্তি অভিযানের ব্যর্থতা তাদের এক অভিনব পথের দিকে ঠেলে দিল। এই পথের দিশারী ছিলেন:

(ক) মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম—নলডাঙ্গা ইউনিয়ন সরকার প্রধান।

(খ) মোহাম্মদ রইছউদ্দিন সরকার—শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে ইউনিয়ন সদস্য।

(গ) মোহাম্মদ আবদুল কাদের—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সমন্বয়কারী।

গাইবান্ধার অভিজ্ঞতা

১১। তারা বুঝতে পারছেন যে প্রতি গ্রামে নৈশ স্কুল খুলে যে প্রচেষ্টা তারা করছিলেন তাতে এত বড় সমস্যার সমাধান হতে পারে না। পাশের গাইবান্ধা থানায় এই নৈশ স্কুলের মাধ্যমে সরকারী প্রচেষ্টায় যে বয়স্ক শিক্ষা চলছে তাতে গত ১৩ বৎসরের (১৯৬৩-৭৮) একটি ইউনিয়নও নিরক্ষরতা মুক্ত হতে পারেনি।

নৈশ স্কুল

১২। নৈশ স্কুলের জন্য চাই বই, খাতা স্লেট, পেন্সিল, বসবার জন্য ঘর লণ্ঠন, কেরোসিন ও বেতনভুক শিক্ষক। এসব দিয়েও দেখা গেল যে শ্রান্ত ক্লান্ত অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন এই নিরক্ষরদের বেশি দিন নৈশ স্কুলে আসার উৎসাহ থাকে না।

মাটি আর কাঠি পদ্ধতি

১৩। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নলডাঙ্গা ইউনিয়ন সরকার প্রতিটি ঘরকেই একটি স্কুলে পরিণত করলেন। প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে হতে হলো শিক্ষক। নিজের ঘরের নিরক্ষর ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দান করার দায়িত্ব পড়লো সেই ঘরের শিক্ষিত ব্যক্তির উপরে। খাতা কলমের জায়গায় এলো মাটি আর কাঠি। যার যে খানে সুবিধা হয় ও সময় হয় তখনই সে নাম লেখা শুরু করলো। মহিলাদের নাম লেখা হল চুলার পাশে—পুরুষদের ঘরের দরজায়। কাগজ হলো মাটি আর কলম হলো কাঠি।

প্রথম ধাপ (টিপসই মুক্ত)

১৪। ৯ই অক্টোবর, ১৯৭৮-এ এমনি করে মাটির বুকে আঁচড় দিয়ে শুরু হলো গণশিক্ষা অভিযান। লাঙ্গলের ফলা দিয়ে মাটির বুক চিরে যেমন চাষী নিয়ে আসে সোনালী ফসলের সমারোহ, নলডাঙ্গা ইউনিয়ন সরকার ঠিক তেমন করে মাটির বুক চিরে নিয়ে আসতে শুরু করলো গণশিক্ষার ফসল। পাড়ায় পাড়ায় ছেলে গেলে 'টিপসই—ছিঃ ছিঃ ও অন্যান্য শ্লোগানে' মুখর হয়ে উঠলো। টিপসইয়ের গ্লানী ঘুচে গেল নলডাঙ্গা ইউনিয়নে। দুই সপ্তাহের মধ্যে (অক্টোবর ৯-২১) প্রায় সকল সক্ষম ব্যক্তিই নিজের নাম লেখা শিখলো।

সাদুল্লাপুর থানা টিপসই মুক্ত

১৫। সাদুল্লাপুর অন্যান্য ১০টি ইউনিয়নও এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হলো। তারাও মাটি ও কাঠির জীবন স্পর্শে জেগে উঠলো। ১৯৭৯ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষে নিরক্ষরতা বিদায় নিলো সাদুল্লাপুর থানার প্রায় সকল সক্ষম ব্যক্তিদের ঘর থেকে।

টিপসই মুক্ত থানা

১৬। ধীরে ধীরে মাটি ও কাঠির জীবন স্পর্শ ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি পেল বাংলাদেশের ৪৪টি থানায়। চললো পরিপূরক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মাটি ও কাঠি পদ্ধতিতে গণশিক্ষার অভিযান। মাটি কাঠি পদ্ধতির পথ বেয়ে যে থানাগুলি নিরক্ষরতা মুক্ত হয়েছে সেগুলি হলো:

১। সাদুল্লাপুর ২। কিশোরগঞ্জ ৩। কাঠালিয়া ৪। শাহরাস্তী ২১শে ফেব্রুয়ারী '৮০ থেকে গণশিক্ষা কর্মকাণ্ড এ সকল থানায় পুনোদ্যমে চলছে।

কিশোরগঞ্জ মহকুমা

১৭। ১৭ই ডিসেম্বর '৭৯ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জ স্বনির্ভর কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কিশোরগঞ্জ মহকুমার জনগণ ওয়াদা করেছেন, তারা তাদের মহকুমা সম্পূর্ণ রূপে নিরক্ষরতা মুক্ত করবেন। শুরু হয়েছে তাদের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বনির্ভর বাংলাদেশের সাথে একযোগে কিশোরগঞ্জ মহকুমার ১২টি থানাকে নিরক্ষর মুক্ত করার কাজ করে যাচ্ছে।

(অসমাপ্ত)